International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-I, February 2016, Page No. 1-7
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন : অন্তরঙ্গ পাঠ

Dr. Goutam Kumar Nag
Associate Professor (French) & H.O.D, Dept. of Foreign Languages, University of Burdwan, West Bengal, India

Abstract

The aim of the present paper is to explore the linguistic elements of a popular song of Tagore, composed on the theme of winter: shīter hāowār lāglo nācan. Our study is limited to the poetical framework of the song; the musical aspect is excluded. Through an in depth study of the salient linguistic features of the song we have tried to demonstrate how the theme of winter has been developed at various levels: phonetic, lexical, morpho-syntactic and semantic levels. Our objective is also to determine the place that this season occupies in the universe of Tagorean thought. Throughout the article we have referred to different songs, composed on the same theme and we have ended up the discussion with a brief comparative study.

Key Words: Winter, Tagorean thought, linguistic features, comparative study.

এই নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের শীত উপপর্যায়ের একটি সুপরিচিত গানের অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ : শীতের হাওয়ার লাগল নাচন (প্রকৃতি / গানসংখ্যা ১৭৬)। সাঙ্গীতিক রূপটি নয়, গানের কাব্যরূপটি আমাদের আলোচ্য। এই গানের কাব্য অবয়বের সৌন্দর্য আস্বাদনের লক্ষ্যে আমরা এর বিভিন্ন গঠক উপাদান বিশ্লেষণ করব : শব্দচয়ন, পদসমূহের পারস্পরিক অন্বয়, বাক্যের গঠনকৌশল, বিভিন্ন ব্যাকরণগত উপাদানের ব্যবহার। সেইসঙ্গে আমরা একই ভাববস্তুর উপর নির্মিত গানগুলির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে শীতের গানগুলির মধ্যে এই গানটির স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে॥
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার রইল না আর অন্তরালে॥
শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন্‌ সকালে॥[১]

গানের সূচনা শীতের হাওয়ায় আমলকীবৃক্ষের পাতা ঝরার একটি অতিপরিচিত দৃশ্যের অভিনব উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। শীতের বাতাস আর আমলকীবৃক্ষের সম্বন্ধ চিরাচরিতভাবে ভয়ভীতির। শৈশবে সহজপাঠ থেকেই আমরা তার পরিচয় পেয়ে আসছি : শীতের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই, শরতের সমাগমের মুহূর্ত থেকে বাতাসে হিমেল স্পর্শ পাওয়া মাত্রই আমলকী বনের বুক দুরুদুরু করে— পাতা খসানোর সময় আসন্ন ভেবে। অনুরূপ একটি দৃশ্য দেখা যায় শীতের আর একটি গানে (প্রকৃতি / ১৮৫)

আমলকি -ডাল সাজল কাঙাল, খসিয়ে দিল পল্লবজাল,[২]

শুধু আমলকীবনেই নয় এই গানে দেখা যায় শীতের আবির্ভাবে ভীতসন্ত্রস্ত আবহ সর্বত্র, সন্ত্রস্ত শিউলিফুলেরাও, কাশের হাসি মিলিয়ে যায়, পত্ররাজি , তৃণদল পাণ্ডুর রূপ ধারণ করে, ঝুমকোলতা বিবর্ণ হয়ে যায়। ঋতুনাট্যের রঙ্গমঞ্চে শীতের বাতাসের প্রবেশ ঘটে শাসকের বেশে

উত্তরবায় জানায় শাসন[৩]

আমলকীবৃক্ষ আর শীতের এই শত্রুতার সম্বন্ধটি শুধু শীতের গানেই নয়, অন্যত্রও ধরা পড়ে। প্রেম পর্যায়ের এই গানটিতে (প্রেম /১৭৩) আমলকীবনে শীতের বাতাসের আবির্ভাব আরও নিষ্করুণ রূপে। শীত শুধু আমলকীবৃক্ষকে রিক্ত, নিঃস্ব, করে না, আমলকীবনকে ঘিরে সে মৃত্যুর বিষাদঘন পরিমণ্ডল রচনা করে।

শীতের হাওয়ায় ঝরায় পাতা, আম্‌লকী-বন মরণ-মাতা,
বিদায়বাঁশির সুরে বিধুর সাঁজের দিগঞ্চল॥[৪]

আমাদের আলোচ্য গানে আমরা শীতের বাতাসের এক ভিন্নতর রূপ প্রত্যক্ষ করি। এখানে কঠোর শাসকের ভূমিকায় সে অবতীর্ণ নয়, এই গানে " একি মায়া" (প্রকৃতি / ১৮৩) গানটির মত হিমেল হাওয়ায় "গগনভরা ব্যাকুল রোদন" বাজে না। ভয়ভীতির লেশমাত্র কোথাও নেই; এই গানে বিধৃত চিরনির্মম শুষ্ক কঠোর শীতের বাতাসের এক উচ্ছল, নৃত্যচপল রূপ।

আস্থায়ী জুড়ে সেই নৃত্যলীলার প্রকাশ। প্রথম কলির প্রথমার্ধের শেষে "নাচন", দ্বিতীয় কলির দ্বিতীয়ার্ধের শেষে "তালে তালে"। এখানে দ্বিতীয় কলির গঠনটি বিশেষ প্রাসঙ্গিক। গানের প্রথম কলিতে ক্রিয়ার কর্তা (শীতের হাওয়ার) নাচন, কিন্তু দ্বিতীয় কলিতে কর্তা উহ্য। পাতাগুলি কে ঝরিয়ে দিল ? সম্ভাব্য উত্তর দুটি। একটি সম্ভাবনা : প্রথম কলির মত এখানেও ক্রিয়ার কর্তা (শীতের হাওয়ার) নাচন। দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই অনুক্ত কর্তা আমলকী গাছ বা আমলকী ডাল। অর্থাৎ আন্দোলিত আমলকীবৃক্ষই নৃত্যের তালে তালে একটি একটি করে পাতা ঝরিয়ে দেয়। দুটি ব্যাখ্যাই সমান গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করলে বলতে হয় শীতের হাওয়া ও আমলকীবৃক্ষের চিরাচরিত সম্পর্ক নূতন রূপ নিয়েছে। দুই চিরশত্রু আজ নৃত্যসঙ্গী, নৃত্যরসে দুজনে মাতোয়ারা।

অনুক্ত কর্তার মত ক্রিয়ার কর্মের ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। ধন্যাত্মক অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ("শিরশিরিয়ে"), বিশেষত ক্রিয়াপদের দ্বিত্বে (গাইবার সময় ক্রিয়াপদটি দুবার গাওয়া হয়) মূর্ত হয়ে ওঠে পত্ররাজির শিহরণ। কিসের সেই শিহরণ ? "শিরশিরানি" সাধারণভাবে নেতিবাচক অনুষঙ্গবাহী, তা অস্বস্তিরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এই কলির শেষে দ্বিরুক্ত শব্দ "তালে তালে" এক নূতন মাত্রা যোগ করে। পাতারা ঝরে পড়ে "তালে তালে"— তাদের চলে যাওয়ার মধ্যে কোন হাহাকারের সুর বাজে না— এই ঝরে পড়ার মধ্যে ফুটে ওঠে এক অনুপম ছন্দোময় সৌষম্য— যার প্রকাশ এই দ্বিরুক্ত শব্দবন্ধে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঝরে পড়া পাতাকে বিশেষিত করতে কোন নেতিবাচক অনুষঙ্গবাহী বিশেষণ কোথাও ব্যবহৃত হয় নি : "শুকনো" "শুষ্ক" "জীর্ণ"। ঝরে পড়া পাতাদের প্রতি কোথাও অনাদর, অবহেলা বা অনুকম্পা প্রকাশ পায় নি। এই নৃত্যরঙ্গের তারাও সঙ্গী। চিরাচরিতভাবে বিষাদজাগানো একটি দৃশ্য এমনি করে রূপান্তরিত হয়েছে সৌন্দর্যসঞ্চারী এক আলেখ্যে ।

এই নৃত্যলীলার অভিব্যক্তি গানের কাব্য অবয়বের ধ্বনিগত গঠনের স্তরেও । এইক্ষেত্রে লক্ষণীয় দ্বিরুক্ত শব্দের পুনরাবৃত্তি : "তালে তালে" "ডালে ডালে"। এছাড়াও "লাগল নাচন" শব্দবন্ধটি এবং "শিরশিরিয়ে" ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়াটি গাইবার সময় দুবার গাওয়া হয় : "লাগল নাচন" "লাগল নাচন", "শির্‌শিরিয়ে" "শির্‌শিরিয়ে"। শব্দ বা শব্দবন্ধের এই পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে যেন এক নৃত্যচঞ্চল চরণসম্পাত বেজে ওঠে। সঞ্চারিত হয় এক ঘূর্ণায়মানতার অনুভূতি।

নৃত্য কেবল মনুষ্যসৃষ্ট শিল্পকলা নয়, বাদ্যযন্ত্রের ছন্দে অঙ্গসঞ্চালন নয়, রবীন্দ্রচেতনাবিশ্বে নৃত্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রবহমান এক অনাদ্যন্ত ছন্দ— যার প্রকাশ মহাবিশ্বের গতিময়তায়, বস্তুপুঞ্জের আবর্তনে, পরিব্যাপ্ত নিসর্গসৌন্দর্যলীলার পরতে পরতে, ষড়ঋতুর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায়, মগ্নচেতনার স্তরে স্তরে, প্রতিদিনের জীবনের সুখদুঃখে, হাসিকান্নায়, বিরহমিলনে। নৃত্যের ছন্দে সমস্ত বিপরীতের মধ্যে সব ব্যবধান ঘুচে যায়, একই সূত্রে তারা বাঁধা পড়ে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিচিত্র পর্যায়ের এই গানটি (বিচিত্র/৬) –

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥[৫]

এই গানে আমরা দেখি একই নৃত্যছন্দে ধরা পরে জন্ম-মৃত্যু, হাসিকান্না, ভালোমন্দ, বন্ধন-মুক্তি। সেই ধারা অনুসারে শীতের এই গানে আমরা দেখি নৃত্যলীলা দুই চিরবৈরী আমলকীবৃক্ষ আর হিমেল বাতাসকে মিলিয়ে দিয়েছে।

আস্থায়ী জুড়ে যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায় তার ধারাবাহিকতা অন্তরার প্রথম কলির প্রথমার্ধ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। “ঝরিয়ে” দেওয়ার পর আসে “উড়িয়ে” দেওয়ার পালা— উদ্দাম গতিময়তা অধ উর্ধ সর্বত্র জুড়ে বিস্তার লাভ করে। আস্থায়ীর প্রথম কলিতে ছিল “নাচন”; অন্তরার প্রথম কলিতে প্রায় প্রতিসম অবস্থানে আসে “মাতন”। নৃত্যগতি তীব্রতর হয়ে ওঠে। কিন্তু তার ঠিক পরই একটা করুণ সুর বেজে ওঠে। আলোচ্য কলিটির দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই একটি স্পষ্ট নেতিবাচক অনুষঙ্গবাহী বিশেষণ “কাঙাল”। ধ্বনিগত স্তরে এই কলির দুই অর্ধাংশের মিলটি লক্ষণীয়— এসে / শেষে। ‘শ’ ধ্বনির (তিনটি ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ হলেও উচ্চারণগতভাবে একটিই ধ্বনি) পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে সবহারানোর হাহাকারভরা দীর্ঘশ্বাস। মনে পড়ে যায় অব্যবহিত পূর্বে উদ্ধৃত শীতের গানের এই কলিটি

আমলকি-ডাল সাজল কাঙাল, খসিয়ে দিল পল্লবজাল

কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানে দেখি আমলকীবৃক্ষের এই দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় তার পূর্ণবৈভব। নয়নাভিরাম পত্ররাজির বিদায়ের পরই প্রকাশিত হয় তার ফলভারনত সৌন্দর্য। বহিরঙ্গ সৌন্দর্য ঘুচে গিয়ে উন্মোচিত হয় তার অন্তরের সৌন্দর্য, অন্তরের পূর্ণতা। এখানে “নটীর পূজা” নাটকের শেষ দৃশ্যটি মনে পড়ে যায়। শ্রীমতী সুন্দর হয়েছিল, পূর্ণ হয়েছিল যখন সে নৃত্যের তালে তালে একটি একটি করে আভরণ, তারপর রাজবেশ আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করে অবশেষে ভিক্ষুণীর চীরবাসে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শ্রীমতীর এই পূর্ণতা কিন্তু প্রতীকী। অন্যদিকে নিষ্পত্র ফলভারাবনত আমলকীবৃক্ষের শোভা একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহী বাস্তব।

এই গানে আমরা দেখি শীতের রিক্ততা ও পূর্ণতার যুগলরূপ। শীতের অন্যসব গানে দেখা যায় শুধুই শীতের পূর্ণতা অথবা শুধুই তার শূন্যতার বাণীরূপায়ণ। এই পর্যায়ের বারটি গানের মধ্যে দুটিতে দেখি শীতের পূর্ণতার রূপ— “এল যে শীতের বেলা” (প্রকৃতি/১৭৮) এবং “পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে” (প্রকৃতি/১৭৯)। উল্লেখ্য শীতের পূর্ণতার রূপটি দেখা যায় শুধু ভরাক্ষেতের প্রাচুর্যে। শীতের গানে কোথাও শীতের ফুলের সমারোহ দেখা যায় না। বনবীথিকায়, কুসুমকাননে, তার আবির্ভাব নির্দয় সর্বস্বাপহারীর মত। প্রেম পর্যায়ের এই গানটিতেও (প্রেম / ২৮৮) শীতের উপস্থিতি ফুল-ঝরানোর ঋতুরূপে :

এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল-ঝরানো শীতের রাতে
কুহেলিকায় মন্থর কোন্ মৌন সমীরণে।[৬]

শীতের রিক্ত আকিঞ্চন রূপটি দেখা যায় সাতটি গানে : “ শিউলি-ফোটা ফুরোল”(প্রকৃতি/১৭৭), “ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো” (প্রকৃতি/১৮০), ““আমরা নূতন প্রাণের চর” (প্রকৃতি/১৮১), “একি মায়া” (প্রকৃতি/১৮৩), “মোরা ভাঙব তাপস” (প্রকৃতি/১৮৪) “শীতের বনে কোন্ সে কঠিন আসবে বলে” (প্রকৃতি/১৮৫), “হে সন্ন্যাসী” (প্রকৃতি/১৮৭)। বাকি দুটি গানকে

পূর্বোক্ত কোন শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। "আর নাই রে দেরি" (প্রকৃতি/১৮২) গানে অভিব্যক্ত উচ্ছলতার অনুভূতি সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। নৈসর্গিক চিত্রকল্প যেটুকু চিত্রিত তার ভিত্তিতে এই গানের শ্রেণিবিন্যাস সম্ভব নয়। অতিসংক্ষিপ্ত "নমো, নমো" (প্রকৃতি/১৮৬) গানটিতে নৈসর্গিক রূপকল্প সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শীতের রিক্ত বা পূর্ণ কোন রূপই দৃষ্টিগোচর হয় না; এই গানটি শীতের "নির্দয়", "নির্মম" রূপটি ঘিরে কবিহৃদয়ে সঞ্চারিত অনুভূতির প্রকাশ। শীত উপপর্যায়ের গানগুলির সামগ্রিক পর্যালোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্ত আসতে পারি যে শূন্যতা ও পূর্ণতার সহাবস্থান আছে শুধুমাত্র আমাদের আলোচ্য গানটিতেই।

উপরোক্ত বক্তব্যের সূত্র ধরে এই গানে এবং সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমলকীবৃক্ষের ভূমিকার সম্বন্ধে একটি সংযোজন করা যেতে পারে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতে উদ্ভিদ ও ফুলের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানা যায় গীতবিতানে আমলকীর ব্যবহার চারবার।[৭] প্রয়োগসংখ্যা যত সামান্যই হোক না কেন, এই গানে এর প্রয়োগবৈশিষ্ট্য গানটিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে। এই গানে দেখা যায় শীতের লীলা সম্পূর্ণভাবে আমলকীবৃক্ষকে কেন্দ্র করে— গানে আর শীতের বা অন্য কোন নৈসর্গিক রূপকল্প নেই। আস্থায়ী ও অন্তরাতে, আটকলিবিশিষ্ট গানের মধ্যে চারটি কলিতে, অর্থাৎ গানের অর্ধাংশ জুড়েই আছে এই বৃক্ষ। আর কোথাও— শীতের বা অন্য আর যে কোন গানে— আমরা কোন উদ্ভিদকে গানের এতখানি স্থান অধিকার করে থাকতে দেখি না। এই বৃক্ষটিকে নির্বাচন করা হয়েছে শীতের দ্বৈতসত্তার চিত্রায়ণের জন্য।

অন্তরার কথাবস্তুর সঙ্গে এর গঠনকৌশলটিও লক্ষণীয়। এই অংশে আমলকীবৃক্ষের শূন্যতার রূপ চিত্রিতে করতে একটি সদর্থক বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে : উড়িয়ে দেবার মাতন এসে কাঙাল তারে করল শেষে। পক্ষান্তরে নঞর্থক বাক্যের মধ্য দিয়ে তার পূর্ণতার রূপটি অভিব্যক্ত হয়েছে : তখন তাহার ফলের বাহার রইল না আর অন্তরালে। যে নৃত্যের ছন্দে দুই চিরশত্রু শীত আর আমলকীগাছের মধ্যে সমস্ত দূরত্ব ঘুচে যায়, সেই ছন্দেই যেন 'নেতি' আর 'ইতি'র মধ্যেও সব ব্যবধান অবলুপ্ত হয়ে যায়।

যে সব গানে প্রতিবিম্বিত শীতের সর্বরিক্ততার রূপ তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি এই শূন্যতার মধ্যে পরিপূর্ণতার অনুসন্ধানের প্রয়াস। "একি মায়া" (প্রকৃতি /১৮৩) গানে শীত সর্বহারার ছদ্মবেশী রাজাধিরাজ; এই নীরস কাঠিন্যের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে "রসের কাণ্ডারী"। "আমরা নূতন প্রাণের চর" (প্রকৃতি /১৮৭) গানেও শীতের জরাজীর্ণ রূপ তার ছলনা মাত্র। নূতন প্রাণের চরদের সোল্লাস ঘোষণা :

তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে, নাই যে অগোচর হা হা।।[৮]

দুটি গানে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরূপী শীতকে নবীন বসনে বিভূষিত করার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। "মোরা ভাঙব তাপস" (প্রকৃতি /১৮৪) গানটিতে তপস্বী শীতের তপোভঙ্গ করে বলপূর্বক নববস্ত্রে তাকে সজ্জিত করতে সকলে কৃতসঙ্কল্প। "হে সন্ন্যাসী" (প্রকৃতি /১৮৭) গানে শীতের প্রসন্নতা যাচঞা করা হচ্ছে; তাকে মিনতি করা হচ্ছে কঠোর, রুদ্র রূপ সংহরণ করে বিবাহসাজে অবতীর্ণ হতে।

এই সমস্ত গানে শীতের শূন্যতা কবির দৃষ্টিতে বহিরাবরণ মাত্র। শীত ছদ্মবেশী বসন্ত; শীতের নিষ্প্রাণ রুক্ষতার মধ্যে আছে অনাগত বসন্তের অনুপম রূপবিস্তারের স্বপ্ন। শীতের সেই গোপন বৈভব উদ্ভাসিত কবির অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিচেতনায়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানে আমলকীবৃক্ষের রূপবৈচিত্র্য সম্পূর্ণভাবেই ইন্দ্রিয়চেতনায় বিধৃত একটি দৃশ্য— যা কবিকল্পনার নির্মাণ নয়— প্রকৃতির নিয়মেই যা ঘটে । আস্থায়ী ও অন্তরা অংশে অনাগতের কোন বাণী নেই, কবির দৃষ্টি বর্তমান বাস্তবে নিবদ্ধ। পাতা-ঝরার মধ্যে নূতন পাতার আবির্ভাবের আশ্বাসবাণী নেই, শুধু সৌন্দর্যসঞ্চারের জন্যই এই দৃশ্যের অবতারণা। শীত এই গানে নববসন্তের অগ্রদূতরূপে বন্দিত হয় নি; সে রয়েছে তার আপন অধিকারে। কবির দৃষ্টি এখানে ইন্দ্রিয়চেতনার সীমানা অতিক্রম করে নি।

সেই অতিক্রমণের প্রয়াস শুরু হয় সঞ্চারী থেকে। শীতের শূন্যতা এবং পূর্ণতা যার অন্তবিহীন লীলার বিচিত্র অভিব্যক্তি সঞ্চারীতে দেখি সেই লীলাময়ের সন্ধানে নিরত কবি। তারই প্রতীক্ষাতে সকল বেলা অতিক্রান্ত হয়ে যায়— এই প্রতীক্ষা শীতের শূন্যতার মুহূর্তে বসন্তের জন্য সেই চিরাচরিত প্রতীক্ষা নয়।

অন্তরা পর্যন্ত আছে শুধুই শীতের দৃশ্য, দ্রষ্টা থাকেন অন্তরালে। গানের পরবর্তী অংশে দ্রষ্টার উপস্থিতি অনুভব করা যায়— সঞ্চারীতে ক্রিয়াপদের ("রইনু বসে") এবং আভোগে সর্বনামের ("আমার") মধ্য দিয়ে।

সঞ্চারীতে কবির কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই, তিনি শুধু "বসে" থাকেন। "নাচন" "উড়িয়ে দেওয়ার" "ঝরিয়ে দিল" "মাতন"— এই সমস্ত গতিদ্যোতক বিশেষ্য এবং ক্রিয়ার পর আসে স্থিতিদ্যোতক ক্রিয়া "রইনু বসে"। উদ্দাম নৃত্যচঞ্চলতার পর আসে নিবিড় ধ্যানতন্ময়তা।

সঞ্চারীর সঙ্গে গানের বাকি তিন তুকের গঠনগত একটা পার্থক্য চোখে পড়ে। অন্য তিনটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কলি এক একটি সম্পূর্ণ বাক্য। শুধুমাত্র সঞ্চারীতেই একটি বাক্য দুটি কলিতে বিস্তৃত। বাক্যের এই দীর্ঘতর আয়তনকে প্রতীক্ষার দৈর্ঘ্যের প্রতিফলন বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সঞ্চারীতে অনুপস্থিতির পর আভোগে আবার "শীতের" প্রত্যাবর্তন। আভোগের সঙ্গে আস্থায়ী অংশের প্রতিসাম্য লক্ষণীয়। আস্থায়ীর শুরুতে (বা গানের শুরুতে) ছিল "শীত"; আভোগের শুরুতে অর্থাৎ গানের শেষের শুরুতেও "শীত"; উভয়ক্ষেত্রেই সম্বন্ধপদের রূপটি পাওয়া যায় : শীতের। অন্তরা ও সঞ্চারীতে অনুপস্থিতির পর আস্থায়ীর মত আভোগে আবার দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার ঘটে : তালে তালে / ডালে ডালে; থেকে থেকে / ডেকে ডেকে। পার্থক্য এই যে আস্থায়ীতে দ্বিরুক্ত শব্দের অবস্থান দুই কলির শেষে; আভোগে এদের অবস্থান একই কলির দুই অর্ধাংশের শেষে। উভয় তুকের প্রথম কলির শেষে অবস্থিত দ্বিরুক্ত শব্দের ঠিক আগে নির্দেশাত্মক বিশেষণ : এই / ওই।

এই গঠনগত প্রতিসাম্যের আলোকে এবার আভোগ অংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাক। ভাবনিমগ্নতার মুহূর্তের পর শীতের পুনরাবির্ভাব ঘটে— কিন্তু শীত তখন দূরের। এই ব্যবধানের প্রতিফলন আস্থায়ীতে নৈকট্যদ্যোতক নির্দেশক বিশেষণ "এই"র প্রতিসম অবস্থানে আভোগে দূরত্বব্যঞ্জক "ওই"র প্রয়োগে। শীতের অবস্থান ইন্দ্রিয়চেতনাবলয় থেকে দূরে। সেইসঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া "যায়" সেই দূরত্বের ক্রমবর্ধমনতার সঙ্কেত দেয়। আস্থায়ী ও অন্তরা জুড়ে শীতের হাওয়ার নাচন পরপর যে চিত্রকল্প রচনা করে তা ইন্দ্রিয়চেতনায় বিধৃত সত্য। তারপর শীতের দৃশ্যকল্প মিলিয়ে যায়, শীতের চকিত স্পর্শ মেলে। "শীতের হাওয়ার নাচন"এর প্রতিসম অবস্থানে আসে "শীতের পরশ"— বলা চলে "শীতের হাওয়ার পরশ"। এই শীতের পরশ শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি নয়। এই স্পর্শের মধ্যে নিহিত আছে কোন বার্তা—ইন্দ্রিয়চেতনায় যা অধরা। এই শরীরী অনুভূতি গৌণ, প্রধান তার অন্তর্নিহিত গভীর বার্তা। "থেকে থেকে" "ডেকে ডেকে"— দ্বিরুক্ত শব্দের এই পুনরাবৃত্তি দূরায়মান শীতের সেই আহ্বানকে দীর্ঘায়িত করে। এই দ্বিরুক্ত শব্দগুচ্ছের ধ্বনিগত চরিত্রটিও তাৎপর্য। আস্থায়ীর দুই কলিতে অন্ত্যমিল ছিল "তালে তালে" / "ডালে ডালে" শব্দগুচ্ছে অর্থাৎ স্বরবর্ণের প্রয়োগের ছবিটা ছিল এইরকম :

আ - এ - আ - এ - আ - এ - আ - এ

'আ' 'এ' - এই দুই স্বরবর্ণের পর্যায়নুক্রমিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে একটা উত্থান পতনের রূপ ফুটে ওঠে— যাকে নৃত্যশীল চরণপাতের রূপায়ণ বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অন্যদিকে আভোগের দুই কলির মধ্যে অন্ত্যমিল না থাকলেও প্রথম কলির দুই অর্ধাংশের মধ্যে মিল দেখা যায় : থেকে থেকে / ডেকে ডেকে। এখানে একই স্বরধ্বনির পৌনঃপৌনিক প্রয়োগ ঘটেছে । এই মিলের ছবিটি হবে এই রকম

এ -এ- এ- এ- এ- এ- এ -এ

'এ' ধ্বনির এই পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে সেই ভাষাহীন নীরব আহ্বান যেন এক দূরাগত কণ্ঠস্বরের রূপ পরিগ্রহ করে।

সঞ্চারীর শেষ কলির পর আবার আভোগের শেষ কলিতে কবির উপস্থিতি। এখানেও কবির একই ভূমিকা— তিনি প্রতীক্ষারত। সঞ্চারীর মত আভোগের শেষেও আসে কালবাচক শব্দ : বেলা / সকালে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে কালবাচক শব্দের আগে ব্যাপ্তিদ্যোতক বিশেষণ : সকল। অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কালবাচক শব্দের আগে আসে তিনটি প্রশ্নবোধক শব্দ : কবে, কখন, কোন। যে প্রতীক্ষার সূচনা হয়েছে সঞ্চারী থেকে, আভোগে তার অবসান ঘটে না— সেই প্রতীক্ষা শুধুই দীর্ঘায়িত হয়। কিন্তু শীতের বাতাস সেই প্রতীক্ষার অবসানের পথ বলে দিয়েছে। "যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে"— এই ডাক "সব খোয়াবার" ডাক। যে শীতের হাওয়া আমলকীবৃক্ষকে নিঃস্ব করে তার সংগুপ্ত সৌন্দর্য উন্মোচিত করে, সেই বার্তা সে কবিপ্রানে বারবার বহন করে আনে। সব হারানোর মধ্যেই রয়েছে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। কবি সেই শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষায় থাকেন যখন আমলকীবৃক্ষের

মত সমস্ত বহিরাবরণ ঘুচিয়ে দিতে পারবেন। গানের সমগ্র প্রথমার্ধ জুড়ে থাকার পর পরবর্তী অংশে আমলকীবৃক্ষ সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। কিন্তু শেষ কলিতে না বলা বাণীর ব্যঞ্জনাটুকু অনুধাবন করা যায়। কবি সেই অদৃশ্য আমলকীবৃক্ষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নেন।

এবার শীতের গানের মধ্যে আমাদের আলোচ্য গানটির স্থান নির্ণয় করা যাক। শীতের অন্যান্য গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি কবির ভাবনা শীতঋতুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে, শীতের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস রয়েছে। আমাদের আলোচ্য গানটি বাদে বাকি এগারটি গানের মধ্যে আটটি গানে শীতের উপর ব্যক্তিরূপারোপ (personification) করা হয়েছে। শীতের গানের শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি প্রকৃতি পর্যায়ের ১৮৩ নং গানে শীত ছদ্মবেশী মহারাজা, ১৮৪ নং এবং ১৮৭ নং গানে সে তপস্বী। ১৮০ নং গানে শীত সাগরপারের যাত্রী, ১৮১ নং গানে সে ছদ্মবেশী পলাতক। যে দুটি গানে শীতের পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ১৭৯ নং গানে এই ব্যক্তিরূপারোপ ঘটেছে; পৌষ সেখানে আহবান জানাচ্ছে। যে দুটি গানে শীতের রিক্ততা বা শূন্যতার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে নি তার মধ্যে ১৮৬ নং গানে শীতকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে তার নির্মম রুদ্ররূপকে প্রণাম জানানো হয়েছে। অন্য গানটিতে অর্থাৎ ১৮২ নং গানে শীতের ভূমিকা অন্তরঙ্গ খেলার সাথীর।

আমাদের আলোচ্য গানটি বাদে আর শুধু তিনটি গানেই শীতের উপর ব্যক্তিরূপারোপ করা হয় নি। দেখা যাক এইসব গানে শীত কবির ভাবনাজগতে কি স্থান অধিকার করে আছে। ১৭৭ নং গানে শীত শুধুই পটভূমি; গানের শুরুতে শিউলি-ঝরা বনের চকিত আভাস। শীতের বনে যে আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটছে সে সংশয়াতীতভাবে প্রেমাস্পদ অথবা প্রেমাস্পদা; তারই বরণের প্রস্তুতি সমস্ত গান জুড়ে।

শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই ফুরোল শীতের বনে
এলে যে—
আমার শীতের বনে এলে যে সেই শূন্যক্ষণে॥
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা দুখের সুরে বরণমালা
গাঁথি মনে মনে শূন্যক্ষণে॥
দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে যে রইবে হৃদয়তলে—
আমার বরণমালা রইবে হৃদয়তলে॥
রাতের তারা উঠবে যবে সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে মনে মনে॥ [৯]

এই গানটি প্রেমপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত।

আমাদের আলোচ্য গানের সঙ্গে ১৭৮ নং গানের কিছুটা সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। শেষোক্ত গানটিরও পরিসমাপ্তি ঘটে প্রতীক্ষায়।

বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যাতারা—
আসন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতে
যে সাথি আসিবে রাতে তাহারি তরে॥[১০]

কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানের মত এই গানে প্রতীক্ষিত অজানা সাথীর সঙ্গে শীতের রূপকল্পের কোন যোগসূত্র নেই। এই গানে অবশ্য শীতের রূপকল্প শুধু ভরা মাঠ; গানের প্রথমার্ধ জুড়ে আছে শুধুই কর্মব্যস্ততা।

শুধুমাত্র ১৮৫ নং গানেই দেখি আমাদের আলোচ্য গানের মত এক অদৃশ্য অস্তিত্বের অনুসন্ধান :

সাজ-খসাবার হায় এই লীলা কার অট্টরোলে ।[১১]

শেষের আগের কলি পর্যন্ত শীতের একের পর এক রূপকল্পের বিস্তার। শুধু শেষ কলিতে একবার মাত্র এই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য গানের মত দীর্ঘ ব্যাকুল প্রতীক্ষা নেই।

যেমন শীতের পরিপূর্ণতা ও শূন্যতার অখণ্ড রূপের চিত্রায়ণ দেখা যায় শীত উপপর্যায়ের শুধুমাত্র এই গানটিতেই, তেমনি শুধুমাত্র এই গানেই শীতের নৈসর্গিক চিত্রকল্প গভীরতর ধ্যানমগ্ন ভাবনার সঞ্চার করে, যার পরিণতিতে শুরু হয় নিসর্গজগতের অন্তরালস্থিত এক অরূপ সত্তার জন্য অন্তহীন, অধীর প্রতীক্ষা।

উল্লেখপঞ্জী

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৪৯৫ - ৪৯৬
২) তদেব, পৃ ৪৯৯
৩) তদেব, পৃ ৪৯৯
৪) তদেব, পৃ ৩৩৯
৫) তদেব, পৃ ৫৪৫-৫৪৬
৬) তদেব, পৃ ৩৮৬
৭) মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ : রবীন্দ্রসঙ্গীতে উদ্ভিদ ও ফুল, কলিকাতা, বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ ৮
৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৪৯৭
৯) তদেব, পৃ ৪৯৬
১০) তদেব, পৃ ৪৯৬
১১) তদেব, পৃ ৪৯৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩
দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ
বিশ্বাস, অপূর্ব : ঋতুসঙ্গীতে রবীন্দ্র-কবিমানস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬
রায়, আলপনা (সম্পাদিত): রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১
রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৮০
সরকার, পবিত্র : রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক সৃজনভিত্তি ,গানের ঝরনাতলায়, কলকাতা,প্রতিভাস , ২০১৩
সর্বাধিকারী, কেতকী : রবির আলোয় ঋতুদের শোভাযাত্রা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৪
সেন, সুকুমার : রবীন্দ্রনাথের গান, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮২